দৈনিক খবর

সুশিক্ষা বনাম স্বশিক্ষা

॥ নাজিমুদ্দীন মানিক ॥

কয়েকদিন আগে একটি ম্যাগাজিনে পড়া একটি গল্প দিয়েই আজকের লেখাটা শুরু করি। গ্রামের বেসরকারী হাই স্কুল। সরকারের অনুদান দিয়েই চলে। সরকারী অনুদান পেতে হলে জেলা শিক্ষা অফিস থেকে ইন্সপেক্টর গিয়ে স্কুল ইন্সপেকশন করে যে রিপোর্ট দেবেন তার ভিত্তিতেই তা পাওয়া যাবে। তাই স্কুল কর্তৃপক্ষ চেষ্টা-চরিত্র করে জেলা শিক্ষা অফিস থেকে ইন্সপেক্টর সাহেবকে আনার ব্যবস্থা করলেন। গ্রামের স্কুলে ইন্সপেক্টর যাওয়া যে কত বড় ব্যাপার, আমার মত যাঁরা ছোটবেলায় সে ধরনের স্কুলে পড়েননি, তাঁরা তা কল্পনাও করতে পারবেন না। সারা স্কুল সেদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় আদর্শ স্থানীয় হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্র-ছাত্রীতে ভরপুর থাকে। অনেক ছাত্র আছে যারা সারা বছর স্কুলের ধারে-কাছেও ঘেঁষে না, সেদিন তারাও সুন্দর জামা-কাপড় পরে বই-খাতা বগল দাবা করে স্কুলে এসে হাজির হয়, এক একজন যেন সরস্বতীর বরপুত্র। শিক্ষকদের অবস্থাও তাই। তাঁদের সুন্দর হাসি, আর কি কোমল-মসৃণ ব্যবহার।

যাক সে কথা। তো ইন্সপেক্টর সাহেব এলেন স্কুল পরিদর্শনে। নীচের দিকের বিভিন্ন ক্লাস পরিদর্শন শেষে তিনি এসে দাঁড়ালেন দশম শ্রেণীতে। এই ক্লাসে তখন ইতিহাস পড়ানো হচ্ছিলো। ইন্সপেক্টর শিক্ষকের হাত থেকে বইটি নিয়ে মাঝামাঝি বেঞ্চে বসা এক ছাত্রের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে প্রশ্ন করলেন, বলো তো সোমনাথ মন্দির কে ভেঙ্গেছে? ছেলেটি অঙ্গুলি সংকেতের সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালো বটে, কিন্তু প্রশ্নের জবাবে নিরুত্তর রইলো। ইন্সপেক্টর আবার তাড়া দিলেন, বল না হে, কে ভেঙ্গেছে, সোমনাথ মন্দির? ছেলেটি এবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। অনেকটা কাঁদ কাঁদ স্বরেই জবাব দিলো, আমি ভাঙ্গিনি স্যার— কে ভেঙ্গেছে আমি দেখিওনি। আমি কোনদিন ওদিকে যাইনি। জবাব শুনে এবারে ইন্সপেক্টর সাহেবেরই ভ্যাবাচ্যাকা খাবার দশা। তিনি তাকালেন ক্লাস টিচারের দিকে। ক্লাস টিচার একটু দেঁতো হাসি হেসে বললেন, আসলে স্যার, ছেলেটি একটু বোকা এবং কোন গণ্ডগোলের মাঝেও যায় না। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি ও মন্দির ভাঙ্গার কাজে যায়নি। অতখানি দুর্মতি ওর হবে না।

ক্লাস টিচারের কথায় ইন্সপেক্টর সাহেব আর এক দফা বোকা বনলেন। তাকালেন হেড মাস্টার সাহেবের দিকে। হেড মাস্টার সাহেবের মুখ তখন পাংশু বর্ণ। তিনি হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, স্যার ছেলেটির কথা সত্য। ক্লাস টিচার সাহেবও ঠিক কথাই বলেছেন। এই ছেলেটি আমাদের স্কুলের একটি অন্যতম শান্ত ও নিরীহ ছেলে। আমি আপনাকে রেকর্ডপত্র দেখাতে পারবো। কোনদিন কেউ ওর নামে কোন নালিশ করেনি। ওর দ্বারা কোন মন্দির ভাঙ্গা সম্ভব নয়, এটা আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। ইন্সপেক্টর সাহেবের এবার ভিমরি খেয়ে পড়ে যাবার দশা। কোনমতে সামলে নিয়ে হেড মাস্টার সাহেবের কামরায় এলেন। তারপর ইন্সপেকশন খাতায় পুরো ঘটনাটা লিখে মন্তব্য করলেন, আশ্চর্য, এ স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক এমনকি হেড মাস্টার সাহেবও বলতে পারলেন না, সোমনাথ মন্দির কে ভেঙ্গেছে! কাজেই এ স্কুলের ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষা অফিসার কি সিদ্ধান্ত নেবেন, তার ভার তাঁর ওপরই রইলো। আমি আর কোন মন্তব্য করলাম না।

ইন্সপেক্টর সাহেবের রিপোর্ট ও মন্তব্য দেখে শিক্ষা অফিসার বেশ বিপাকে পড়ে গেলেন। তিনি বিষয়টি অতি গুরুতর ও জরুরী বলে পাঠিয়ে দিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এবং মন্ত্রণালয়কেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আবেদন জানালেন। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ছোট, মাঝারি এবং বড় কর্মকর্তার টেবিল ঘুরে ও মন্তব্য সমৃদ্ধ হয়ে রিপোর্টটি গেল খোদ মন্ত্রী মহোদয়ের টেবিলে। রিপোর্টটিতে সবাই তাঁদের ওপরওয়ালার সিদ্ধান্তই কামনা করলেন। মন্ত্রী মহোদয়ও রিপোর্টটি দেখলেন। দেখে প্রথমে ভীষণ চটে গেলেন এমন একটি গুরুতর ঘটনা, তার রিপোর্ট তাঁর কাছে আসতে এতদিন দেরী হলো কেন, তিনি তার জন্যে অন্যান্য সকল অফিসারের কৈফিয়ত তলব করার কথা ভাবতে লাগলেন। এটা অবশ্যই গ্রস নেগলিজেন্স টু দি ডিউটির পর্যায়েই পড়ে। কিন্তু কৈফিয়ত তলব করে তার জবাব পেতে পেতে আরো বেশ কিছুদিন কেটে যাবে। এদিকে পাশেই রয়েছে একটি বৈরী দেশ। তারা যদি এই মন্দির ভাঙ্গার ঘটনা জানতে পারে, তবে সেটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তিনগুণ-চতুর্গুণ করে প্রচারণা চালাবে। কাজেই তিনি আর দেরী না করে অবিলম্বে মন্দিরটি মেরামতের জন্য তাঁর মন্ত্রণালয়ের তহবিল থেকে ১০ লাখ টাকা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, আগামী এক মাসের মধ্যে মন্দিরটি সম্পূর্ণ মেরামত করেই তার কাছে রিপোর্ট দিতে।

ঘটনাটি সেখানেই শেষ হয়েছে কিনা অথবা আর কোথাও পর্যন্ত গড়িয়েছে কিনা এবং মন্ত্রী মহোদয় এক মাস পরে কি রিপোর্ট পেয়েছেন, ওই গল্পে তার কিছুই লেখা হয়নি। তাই আর জানতেও পারিনি। তবে গল্পটির এখানে উদ্ধৃতি দিলাম এই জন্যে যে, এতে আমাদের দেশের বর্তমানকার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যাবে। বাংলাদেশে এখন সার্বজনীন শিক্ষার একটি কর্মসূচীর বাস্তবায়ন চলছে। এদেশে বর্তমানে ৪৬ হাজার প্রাথমিক স্কুল, ২৩ হাজার হাই স্কুল, কয়েক হাজার কলেজ এবং ৪৭২টি ডিগ্রী কলেজ রয়েছে। এসব স্কুল-কলেজের মধ্যে বেশ কিছু সরকারী এবং বাকীগুলো সরকারী অনুদান প্রাপ্ত। কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু না বলে শুধু এটুকুই বলবো যে, ইদানীং বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতি রোববার 'বলুন দেখি' নামে যে অনুষ্ঠানটি নিয়মিত প্রচার হচ্ছে, কেউ যদি তা দেখেন তবে তা থেকেই ব্যাপারটি আঁচ করতে পারবেন। এই লেখাটি লিখতে বসার মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে আমি তা দেখেছি। এডইনট্রিম, এক্স অফিসিয়ো, পারকেপিটা এবং স্ট্যাটাসকো শব্দগুলোর অর্থ ঢাকার একটি প্রধান কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রধান হলের ৮ জন ছাত্রের কারো পক্ষেই বলা সম্ভব হয়নি।

এখন অহরহ আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির কথা শোনা যাচ্ছে। ১৯৬১ সালের আদম শুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী তৎকালীন বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার ছিলো শতকরা ১৭ জন। ১৯৭৪ সালের আদম শুমারিতে এই হার শতকরা ২৪, জনে উন্নীত হয়েছিলো। কিন্তু ১৯৮১ সালে এই হার হ্রাস পেয়ে শতকরা ১৯.৭-এ দাঁড়ায়। ১৯৮৭ সালে জনাব মাহবুবুর রহমান শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ২২ বলে এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, গত ১৫ বছরে এদেশে সব ক্ষেত্রে তরক্কী (উন্নয়ন) ঘটলেও শিক্ষিতের হারের ক্ষেত্রে আমরা এখনো ১৫ বছর আগের হারটাও ধরতে পারিনি। এটা নতুন ধারার উন্নয়নের কোন নমুনা বা সার্বজনীন শিক্ষার নব-রূপায়ন কিনা তা অবশ্য আমার জানা নেই।

স্বাধীনতার পর এদেশে সব কিছুর হারই বেড়েছে। ১৯৭১ সালে জনসংখ্যা ছিলো সাড়ে ৭ কোটি এখন সরকারী পর্যায়েই সেই সংখ্যা ১১ কোটি বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। সে সময় চালের দাম ছিলো প্রতিসের ১ টাকা থেকে ১ টাকা ২৫ পয়সা, এখন ১৪/১৫ টাকা, ছাত্র বেতন ছিলো গড়ে ৪ টাকা ৫০ পয়সা, এখন ৩০ টাকা, কাগজের দাম ছিলো প্রতিদিস্তা ৪০ পয়সা এখন ৯/১০ টাকা, কাঠ পেন্সিলের দাম ছিলো ২৫ থেকে ৩০ পয়সা এখন ৫ টাকা, বইপত্রের দামও এর সাথে পাল্লা দিয়ে শতকরা আড়াইশদ ভাগ বেড়েছে। দ্রব্যমূল্য বেড়েছে শতকরা ৫শ' ভাগের মত। আর তার সাথে সাথে সাধারণ মানুষের মাথাপিছু আয় গড়ে শতকরা ১২/১৩ ভাগের বেশী বাড়েনি। প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশ বেড়েছে, কিন্তু তার সাথে সংখ্যানুপাতিক হারে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়েনি। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া হলেও শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের অর্থাৎ শতকরা যে ৯০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছেন তাদের আগ্রহ বাড়েনি বরং হ্রাস পেয়েছে।

এর একমাত্র কারণ জনগণের অর্থনৈতিক দৈন্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া। আমাদের বাল্যকালে দেখেছি বাবা সারাদিন মাঠে কামলা হিসেবে অন্যের মজুর খাটলেও বাড়ী এসে খোঁজ-খবর নিতেন ছেলে পাঠশালা, মক্তব বা মাদ্রাসায় গেছে কিনা। এখন অনেকেই তা করেন না। বরং নিজে কামলা দিতে যাবার সময় ছেলেকেও কোন একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারেন কিনা তার জন্য সাথে করে নিয়ে যান। ভাবেন গরীবের জন্য লেখাপড়া আসেনি বা কি হবে কষ্ট করে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে। অনেক ছেলেই তো বিএ, এমএ পাস করে চাকরির অভাবে বেকার হয়ে ঘুরছে এবং তাতে দরিদ্র পিতা-মাতার বিড়ম্বনার জ্বালা আরো বাড়ছে। অন্যের কথা বলে লাভ নেই। আমারই বড় ছেলে ১৯৮৬ সালে বেশ ভালোভাবে বাণিজ্য বিভাগে এইচএসসি পাস করার পর আমি যখন তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগে ভর্তি করানোর উদ্যোগ নেই, তখন সে বেঁকে বসলো। বললো, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে চার বছরের কোর্স শেষ করার জন্য ৮ বছর ব্যয় করার মত সময় তার নেই। তার চাইতে কোন কলেজ থেকে দুই বছরে বি কম পাস করে সে চার্টার্ড এ্যাকাউনটেন্সী পড়ার চেষ্টা করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তার এ অনীহা আমার জন্য পীড়াদায়ক হলেও কঠিন বাস্তবের আলোকে তার বিচার-বুদ্ধির তারিফ না করে পারিনি।

আমার এক বন্ধুর এক ছেলে ও এক মেয়ে গত বছর এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। লেখাপড়ায় ছেলেটির চাইতে মেয়েটি ভালো। ছেলেটি ঢাকা থেকে সেন্টার বদল করে টাঙ্গাইল না মুন্সীগঞ্জের এক গ্রামের কলেজে নিয়ে যায়। সারা বছর সে কোন লেখাপড়া করেনি। তবুও পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে। আর মেয়েটি ঢাকায় থেকেই পরীক্ষা দেয়। বেচারী সব সাবজেক্ট হায়ার সেকেণ্ড ডিভিশন মার্ক পেয়েও কেবল ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রে পাস করতে না পেরে ফেল করলো। বন্ধুটি বললেন, মেয়েটিকে কি বলে সান্ত্বনা দেবো, ছেলেটি ফেল করলে আমার তেমন দুঃখ হতো না, মনকে প্রবোধ দিতাম যে, সারা বছর লেখাপড়া করেনি তাই ফেল করেছে।

কিন্তু মেয়ের বেলায় তো তা নয়। বেচারী অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া করেছে, কখনো এতটুকু ফাঁকি দেয়নি। অথচ সে-ই ফেল করলো। আসলে আমাদের সমাজের প্রতি স্তরে এখন যে যতবেশী ফাঁকি দিতে পারে সেই ততবেশী বড় এবং মহৎ হতে পারার যে প্রবণতা চলছে, শিক্ষা ব্যবস্থাতেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। অথচ বলা হয়ে থাকে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সে শিক্ষা ব্যবস্থাতেই যদি এমন হয় তবে এ জাতি যে দিন দিন ভগ্ন মেরুদণ্ডধারী হয়ে একদিন মেরুদণ্ডহীন হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে, তা কি কোন অমূলক আশঙ্কা?

বাংলাদেশে মান, যশ, খ্যাতির মত শিক্ষাটাও এখন একটা পণ্যবিশেষ। যে কেউ একজন যে কোন পন্থাতেই অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে পারলেই মান-যশ-খ্যাতি এসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন সংগঠনকে কিছু আর্থিক সাহায্য দিয়ে অনায়াসে দু'একটা সোনার মেডেলও পেয়ে যেতে পারেন। শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাই চলছে। টাকা দিয়ে শিক্ষা কেনার বা সন্তান-সন্ততিকে সুশিক্ষিত করার প্রবণতা এখন এক উদ্দাম প্রতিযোগিতায় রূপ লাভ করেছে। গত বছর এসএসসিতে প্রথম কি দ্বিতীয় হয়েছে এমন একটি মেয়ে তার সাক্ষাৎকারে বলেছে যে, তার বাবা তার ৮টি সাবজেক্টের জন্য ৮ জন প্রাইভেট টিউটর রেখেছিলেন। এ ছাড়াও ছিলেন গৃহশিক্ষক। আর ১৫শ স্থান অধিকারী এক ছেলে বলেছে যে, সে জীবনে কোনদিন কোন প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েনি। স্কুলে যা কোচিং হয়েছে তাই ফলো করেছে। বাড়ীতে বাবা-মা তাকে সাহায্য করেছেন।

৮ জন প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়া মেয়েটি অবশ্যই তার সতীর্থদের তুলনায় সুশিক্ষিতা। কিন্তু কোন প্রাইভেট টিউটরের কাছে না পড়া ছেলেটির মত স্বশিক্ষিত নয়। মেয়েটির লেখাপড়ার পেছনে যতটা তার স্বউপার্জনে, তার চাইতে অনেক বেশী অন্যের উপার্জন সমৃদ্ধি লাভ অর্থাৎ পর-নির্ভরশীলতা। আর ১৫শ স্থানের ছেলেটির যেটুকু সাফল্য তার সবটাই স্বউপার্জিত, পরনির্ভরশীলতা নয়। দোষটা মেয়েটির নয়, তার বাবা মেয়ের জন্য শিক্ষা কিনেছেন, তাকে অর্জন করতে দেননি। যদি তাকে অর্জন করার সুযোগ দিতেন, তাহলে সে হয়ত প্রথম বা দ্বিতীয় হোত না, তার কাছাকাছি অবশ্যই থাকতো। আত্মনির্ভরশীলতার উপার্জনে তৃপ্ত ও সমৃদ্ধ হতে পারতো। ৮টি সাবজেক্টের জন্য ৮ জন টিউটর রেখে তিনি মেয়েটিকে স্বশিক্ষিত হবার পথে বাধাই সৃষ্টি করেছেন এবং এটা যে তার জন্য কত বড় ক্ষতি হয়েছে, তা অবশ্যই পরে বুঝতে পারবেন। আর এভাবেই একশ্রেণীর ধনীক ব্যক্তি সমাজে শিক্ষাব্যবস্থাকেও একটি পণ্যে রূপান্তরিত করে গর্বানুভব বা আত্মতৃপ্তি অর্জন করতে পারেন হয়ত, সামগ্রিকভাবে কাজটা যে ভালো করছেন না, তা যত তাড়াতাড়ি তাঁদের বোধোদয় হবে, দেশ-জাতি ও সমাজের মঙ্গল তত তাড়াতাড়িই সাধিত হবে।

আমাদের দেশে এখন সুশিক্ষিত লোকের কোন অভাব নেই, অভাব স্বশিক্ষিতদের। এক সময় বলা হোত সুশিক্ষিতরাই স্বশিক্ষিত বা স্বশিক্ষিতরাই সুশিক্ষিত। কথাটার সবটাই ঠিক নয়। স্বশিক্ষিতরা সুশিক্ষিত হতে পারেন তাদের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, অন্তরের তাগিদ ও উপলব্ধির মাধ্যমে। কিন্তু সব সুশিক্ষিতই স্বশিক্ষিত নন, অনেকেই ৮ জন টিউটরের কাছে পড়ুয়ার মতই। তাদের পরিশ্রম, সাধনা ও আত্মার উপলব্ধির বেশী প্রয়োজন হয় না। শিক্ষাটা কেবল মানুষের ব্যবহারিক জীবনের জন্যই নয়, আত্মার বিকাশের জন্যও অপরিহার্য। স্বশিক্ষিত লোকের আত্মার বিকাশ যতটা প্রসারিত অধিকাংশ সুশিক্ষিতের ক্ষেত্রে তা বলা যায় না। স্বশিক্ষিতরা অতি কষ্টেও তাদের আদর্শকে স্বার্থের বেদীতে বলি দিতে পারেন না, অনেক সুশিক্ষিত যে অহরহ বিনা দ্বিধায় তা করছেন, আমাদের সমাজে তার হাজারো প্রমাণ রয়েছে।